নারীর অর্থনৈতিক জীবন

ডক্টর শাহনাজ বেগম

অনুবাদ: এ.এফ.এম খালিদ

নারীর
অর্থনৈতিক জীবন

ডক্টর শাহনায বেগম

অনুবাদক: মাও. এ.এফ.এম খালিদ

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট

কলকাতা-১৩

প্রকাশক:
বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭ বি লেনিন সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২১

বিনিময়: ১৫ টাকা

মুদ্রণে: মিমঝিম বুক বাইন্ডিং
কলকাতা-৭০০০০৯

Narir Arthonoitik Jiban
Dr. shahnawaj Begam
Translate: Maulana A.F.M Khalid
Published by: Bangla Islami Prakasani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 -013
Printed by: Rimjhim Book Binding
Kolkata-700 009

Price RS. 15/- only

ভুমিকা

আমরা যারা সমাজ নিয়ে ভাবি, সমাজ বিনির্মাণে দিন রাত একাকার করে চলি, তাদের সামনে আদর্শ সমাজ কল্প ঘুরপাক খায়। বাস্তবের সাথে অমিল থাকায় আমরা সাময়িক ভাবে হলেও নিরাশ হয়ে থাকি। বাস্তবিকই জীবনের মৌলিক বুনিয়াদ হলো সমাজ এবং তারও বুনিয়াদ পরিবার। আমাদের দেশ এবং অনেক দেশেও পরিবার জীবনের ভিতে ধ্বস নেমেছে, বরং আরো হয়েছে ম্যাচাকার। তাই আদর্শ সমাজ গড়ার প্রাথমিক ও মৌলিক কাজ হলো পরিবার জীবনের পূণর্গঠণ। কিভাবে পরিবার জীবনকে সুন্দর ও আদর্শ করে গড়ে তোলা যায়, তার চিন্তা, চেতনা, পরিকল্পনা লাভ করার লক্ষ্যে এই সিরিজের "নারীর অর্থনৈতিক জীবন" এই বইটি পেশ করা হলো। আশা করি আদর্শ পরিবার গঠণে বইটি মূল্যবান তোহফা হিসাবে কাজ করবে। আমরা মূলতঃ কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজের কল্পনা করি বলেই এই বই আমাদের সহায়ক হওয়ার আশা রাখছি।

সহৃদয় পাঠক সমাজ -এর থেকে ঈমানের খোরাক পেতে পারেন বলে আশা করি।

মাও: এ.এফ.এম খালিদ
(অনুবাদক)

বর্তমানে উচ্চ নিচ ভেদাভেদে জীবিকা উপার্জনের ভূত প্রত্যেকের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। প্রত্যেকেই অর্থোপার্জনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। আধুনিক যুগ বস্তুবাদী যুগ। ছেলে কিংবা মেয়ে প্রত্যেকেই লেখাপড়ার বুনিয়াদি গণ্ডি অতিক্রম করেই ক্যারিয়ার গঠনের জন্য, তৎপর হয়ে উঠছে। কেউ কেউ যশ ও খ্যাতি এবং নিজের রুচি ও স্বপ্ন পূরণের জন্য আর কেউ কেউ তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের চাপে পড়ে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দিচ্ছে। কয়েক বছর চেষ্টা-সাধনার পর তারা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেখে অবশেষে কঠোর শ্রম প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফলে তাদের কপালে একটা ভালো বা মাঝারি ধরনের চাকরি জুটে যাচ্ছে। তারা মনে করছে ধরার বুকে তারা স্বর্গ লাভ করেছে। এ দৌড়ঝাঁপের মূল কারণ কি? সর্বপ্রথম একটা মৌলিক বিষয় বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের মন মানসিকতা হয় সম্পূর্ণ, না হয় আংশিকভাবে পাশ্চাত্য মুখি হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

তারা তাদের জীবনের সব সিদ্ধান্ত বা কাজে পাশ্চাত্য প্রভাবে পরাজিত হয়ে চিন্তা করে এবং সে মতই কাজ করে। ফলে তারা না ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে আর না ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তা ধারা সম্পর্কে কোন উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ যে রসব গৌণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, তার সমাধানেও মুসলমানরা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

ইসলাম যে সমাজ ব্যবস্থা গঠনের ধারণা পেশ করেছে বর্তমানে কোথাও বাস্তবে তার কোনো ইতিবাচক নমুনা চোখে পড়ে না। সুতরাং পাশ্চাত্যপন্থী মুসলমানরা বুঝতেও পারছে না যে ওই ধরনের সমাজের অস্তিত্ব লাভ সম্ভব হতে পারে! মুসলমানদের অমনোযোগিতা ও দ্বীন থেকে দূরত্বের ফলে সৃষ্ট কতিপয় সমস্যার উদ্ধৃতি দিয়ে স্বয়ং মুসলমানরা আজ গোটা ইসলামী কানুনকে বদনাম করছে এবং অন্যরা তাতে আনন্দ উপভোগ করে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। তাদের ইসলাম বিমুখিতার দরুন ইসলামের পবিত্র ভাবমূর্তি বিপন্ন। ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার ধারণা পেশ করে তা চোখে পড়ে না। এ পরিস্থিতিতে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা কি? কোন পরিস্থিতিতে তারা অর্থোপার্জনে অংশগ্রহণ করবে কিংবা এ প্রসঙ্গে ইসলামের সীমারেখা ও দাবি কি? এ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে বুঝতে হবে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি বিধান কি?

একজন পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য বন্ধনের মাধ্যমে একটা পরিবার জন্ম নেয়। একেকটা পরিবার মিলে হয় একটা সমাজ। এভাবে একটা পরিবারের অবস্থা হয় বাড়ির একটা ইঁটের মতো। একটা ইট সঠিকভাবে স্থাপিত না হলে বাড়ির মজবুতিতে ত্রুটি দেখা দেবে। অনুরূপভাবে একটা পরিবারের প্রশিক্ষণ ভুল হলে একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। কোন পরিবার পরিচালনা করা, তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা এবং সন্তান-সন্ততির শিক্ষা, বিনোদন ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। একটা পরিবারে থাকে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর পিতা-মাতা ও ভাই-বোন। তাদের ব্যায় নির্বাহের দায়িত্ব কে পালন করবে? তাদের জন্য জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করবে কে এবং সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন মেটাবে কে? ইসলাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে; এসব দায়-দায়িত্ব পালন করবে পুরুষ বা স্বামী। ইসলাম পরিবারের রূপরেখা সুরক্ষিত রাখার পাঠ দিয়েছে এভাবে; ব্যয় ভার বহনের জন্য স্বামী অর্থনৈতিক দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত থাকবে এবং স্ত্রী পরিবারের সদস্যদের দেখভাল করবে, স্বামীর অর্জিত অর্থ মিতব্যয়িতার সাথে উত্তম পন্থায় পরিবার গড়ে তোলার জন্য তা ব্যয় করবে। এভাবে ইসলাম জীবনের যে ধারণা দিয়েছে তাতে নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব কে স্বাভাবিক, মানসিক এবং দৈহিক দিয়ে বন্টন করে দিয়েছে। এই বন্টনের মাধ্যমে ইসলাম অর্থ উপার্জনের দায়দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করেছে এবং তাদের অর্থ উপার্জনে উৎসাহ দিয়েছে। নারীকে তার স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী যাবতীয় গার্হস্থ্য বিষয় উত্তম রূপে সম্পাদন করার উৎসাহ দিয়েছে এবং তাদেরকে ব্যয়ভার বহনের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। এভাবে নারী ও পুরুষকে একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনের জন্য সমানভাবে শরীক করেছে।

আল্ কুরআনে বলা হয়েছে:

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"ঈমানদার পুরুষ এবং নারী একে অপরের সহায়ক ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে"-(আত তাওবাহ: ৭১)

তবে এ থেকে এই ভুল ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে ইসলাম নারীদের অর্থ উপার্জনের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়েছে। না, বরং ইসলাম নারীদের বাড়ি থেকে বের হয়ে কাজ করা, আর্থিক দৌড়ঝাঁপে অংশগ্রহণ করা ও হালাল জীবিকা অর্জন করার অনুমতি দিয়েছে। অবশ্য এর মাধ্যমে যাতে তার পরিবার নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ প্রশ্নই ওঠে না যে নারীদের অর্থ উপার্জনের জন্য বাধ্য করা হবে কিংবা এ বিষয়ে আলোচনা হবে, যে মহিলারা অর্থ উপার্জনে অংশগ্রহণ করতে পারে কি না? পরিস্থিতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে কোন নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে ইসলাম তাকে এ স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে একটা শর্ত আরোপ করেছে যে এজন্য তার মৌলিক দায়িত্ব যেন প্রভাবিত না হয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। ঠিক অনুরূপ পুরুষের ক্ষেত্রে হবে, যদি সে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পালন না করে কিংবা জেনে বুঝে তাতে অলসতা করে।

যদি কোন পরিবারের পুরুষ কোন বৈধ কিংবা শরী'য়াত সম্মত অক্ষমতা বা রোগের কারণে নিজ পরিবারের ব্যয় ভার বহন করতে না পারে তাহলে পরিবারের মহিলা অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলে তা সে করতে পারে, আর এই মেহনতের জন্য সেই মহিলা দ্বিগুণ পূণ্যের অধিকারীণী হবে। অথবা এমনও হতে পারে কোন পরিবারে কোন পুরুষ নেই। মহিলা বিধবা, তার সামনে তার সন্তানের ব্যয় ভার বহনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সে মহিলা অর্থোপার্জনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে সচরাচর জীবনে এমন বহু দৃষ্টান্ত আমরা পেতে পারি, যেখানে নারীর জন্য অর্থ উপার্জন বাধ্যতামূলক না হলেও পরিস্থিতির কারণে এটা জরুরি হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে ইসলাম তাকে

পূর্ণ অনুমতি দিয়েছে। শুধু তাই নয় প্রয়োজন না পড়লেও কেবল নিজের যোগ্যতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কোন মহিলা যদি মনে করে, তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত, সেক্ষেত্রেও ইসলাম তার উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করেনি এবং তাকে চাকরি করতেও বাধা দেয়নি।

বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মহিলাদের যোগ্যতারই বিশেষভাবে প্রয়োজন পড়ে। বিশেষ করে মেয়েদের নানা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ কিংবা কারিগরী প্রতিষ্ঠান, মহিলা হাসপাতাল, মহিলাদের বেসরকারি সংগঠন (NGO), যারা সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে; এমন অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র মহিলা শিক্ষিকা ও কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শীদের প্রয়োজন পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রয়োজন পড়ে। অনুরূপভাবে কেবল মহিলাদের এমন বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে মহিলারাই চাকরি করেন এবং এসব কাজ মহিলারাই উত্তমরুপে সম্পাদন করতে পারেন। ইসলাম যদি মহিলাদের বাড়ির বাইরে কাজ করা একেবারেই আটকে দিত তাহলে বেশ সমস্যা সৃষ্টি হতো। সেজন্য ইসলাম এমন করে নি, বরং মহিলাদের সহায় সম্পদে মালিকানার অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করার স্বাধীনতাও দিয়েছে। অপরপক্ষে পশ্চিমারা মহিলাদের ব্যবসার সামগ্রী বানিয়ে দিয়েছে এবং তাদের একটা অর্থনৈতিক গোলামের মর্যাদা দান করেছে। সেখানে নারীর একটা বিশেষ মর্যাদাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে নারী যে দুর্বল এবং কোমল প্রকৃতির, ইসলাম সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছে। কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ এমন বহু কাজ আছে যা তারা করতে সক্ষম নয়। নারীর উপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া একটা অত্যাচার। যুবতী নারীকে ঋতুচক্র, গর্ভধারণ, প্রসবোত্তর রক্তস্রাব ও পরিশ্রমজনিত নানা ঝক্কি ও কষ্ট সইতে হয়। এ সময় দ্বিগুণ কাজের বোঝা সামলাতে অধিকাংশ সময় তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এ সময় তাদের পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, শারীরিক দিক থেকে এবং মানসিক দিক থেকেও। এ সময় অধিক চাপ তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। প্রকাশ থাকে যে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বাস্থ্যবতী মায়ের প্রয়োজন এবং ইসলাম তার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু পশ্চিমারা এই মূল বাস্তবতাকে একেবারেই উপেক্ষা

করেছে। এই ক্রান্তিকালে মহিলারা ও মেশিনের মত ঘর ও বাইরের উভয় প্রয়োজন পূর্ণ করতে থাকুক এটাই পশ্চিমাদের দাবি।

নারী স্বাধীনতার উদগাতারা এ কথা ভুলে যায় যে, এটা নারী স্বাধীনতা নয় বরং নারীর গোলামী; এটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বন্দিদশা, তারা নারীকে এখানেই ঠেলে দিচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব চোখে পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ Betty Friedan ইত্যাদিদের মতো নারী স্বাধীনতার মধ্যপন্থী ধ্বজাধারীরা পর্যন্ত জানিয়েছেন যে এ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত প্রমাণিত হয়েছে। নারীরা নিজেদের অর্থনৈতিক বন্দিদশায় নিক্ষেপ করে যেসব ত্যাগ স্বীকার করছেন তা তাদের জন্য খুব বেশি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের ধ্বনী অনুরণিত হচ্ছে রান্নাঘরের দিকে ফিরে এসো। আজও সমান অধিকারের সমস্ত জিগির সত্বেও স্বয়ং পাশ্চাত্যের পুরুষশাসিত সমাজ তাদেরকে সেনা বিভাগের চাকরি কিংবা ভারী মেশিন চালানোর কাজে চাকরি দেয় না, এমনকি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারে ও পুরুষ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা ও সহায়তাকেই বেশি অগ্রাধিকার দেয়। বেসরকারি সেক্টরে কোন কোন জায়গায় আজও নারীদের মাইনে পুরুষদের তুলনায় কম। অথচ ওইসব দেশে মাইনে দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা আইনত অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত।

নারীরা যখন অর্থনৈতিক দৌড়ঝাঁপে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ রেখে শরীক হয় তখন সমাজে আরেকটি টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। সেটা হল শিশুদের দেখাশোনা, পরিচর্যা ও লালন পালন সমস্যা ! আধুনিক যুগ অবশ্য এ সমস্যার এই হাস্যকর সমাধানটি দিয়েছে; শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য শিশু সদন ও প্লে হাউসের ব্যবস্থা করা, যাতে চাকুরীজীবী নারীদের সন্তানকে অফিসের সময় সেখানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পেশাদার ধাত্রীরা সামলাবে এবং তারা একমনে নিজের চাকরি করে যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এ সমাধানকে ভালো ও সহজ ও সুন্দর মনে করা হয়েছে এবং তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। এ যেন শিশু নয় কোন নিষ্প্রাণ সামগ্রীর দেখাশোনা করা হবে। এতে বাহ্যিকভাবে নারীর অর্থনৈতিক দৌড়ঝাঁপে কোন বাধা পড়ছে না বটে, তবে মানুষের সন্তান কোন পশু শাবক কিংবা নিষ্প্রাণ কোন বস্তু তো নয়! শৈশব কাল থেকেই শিশুর মধ্যে মায়ের আঁচলের নিচে থাকার,মাকে

জাপটে ধরা এবং মায়ের কোলে দুষ্টুমি করার একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করে। ক্রমশঃ এই মনস্তত্ত্বকে পদদলিত করার ফলে শিশুর মধ্যে একটা তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে বঞ্চনার অনুভব বিকাশ লাভ করতে থাকে। দিনের ৭,৮ কিংবা ১০ ঘন্টা মায়ের সাহচর্য থেকে দূরে থাকার ফলে সেও মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মায়ের দূরত্ব অনুভব করতে থাকে। একজন মা চাকরি থেকে ফেরার পথে অবশ্যই তার শিশুকে তার সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে বটে, তবে সে সময় মা এতটা ক্লান্ত শ্রান্ত থাকে যে সন্তানের সঙ্গে থেকেও তাকে তার আকাঙ্খিত সময় দিতে পারেনা, তার দাবি পূরণ করতে পারেনা এবং কথায় কথায় বিরক্তি ও ক্রোধের শিকার হয়। যার নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই শিশুর ওপর পড়ে। শিশুর মধ্যে বঞ্চনার অনুভব তীব্রতর হয়। সন্তানের বাবা যদি এই শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টা করে তাহলে কখনো কখনো সমস্যার কিছুটা সমাধান অবশ্যই হয়, তবে এটাও একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার যে বাবা কখনো মায়ের স্থান দখল করতে পারেনা। একটা সন্তান বাবা কিংবা তার মনোযোগ ছাড়াও থাকতে পারে, তাতে তার খুব একটা উৎকণ্ঠা হয়না। তবে মায়ের মনোযোগ ছাড়া সন্তান আদৌ থাকতে পারে না এবং তার মন-মানসিকতা এই বাল্যকাল থেকেই বিষাক্ত হয়ে যেতে থাকে। ভবিষ্যতে গিয়ে এই ধরনের বাচ্চারা সন্ত্রাসী হতে থাকে কিংবা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করায় অভ্যস্ত হতে থাকে। তাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয় এবং সমাজের সঙ্গে তাদের সুস্থ সম্পর্ক থাকে না। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

অর্থোপার্জনের জন্য নারীরা আরও যে কুরবানীটা করে যাচ্ছে সেটা হল চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার কুরবানী! এটা তার এবং তার ব্যক্তিত্বের জন্য মারণ হলাহল থেকে কোন অংশে কম নয়। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় যে পুরুষদের আধিপত্যের জয়জয়কার, এ তিক্ত সত্য সম্পর্কে কে অবগত নয়? পুরুষরা নারীদের পাওয়ার জন্য কিংবা তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার নিত্য নতুন পন্থা আবিস্কার করে তার ব্যক্তিত্ব থেকে দেদার ফায়দা লুটছে। কোথাও মডেলের নামে, কোথাও সুন্দরী রাণীর সাদৃশ্যের মাধ্যমে, কোথাও চিত্রতারকা রূপে এই নির্বোধ নারীদের অনবরত বেকুব বানানো হচ্ছে। কিছু টাকার বিনিময়ে এইসব ভূমিকায় নারীর যৌনশোষণ করা হচ্ছে। অথচ

যাদের জন্য তারা এ কাজ করছে তারা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে নিচ্ছে। আজ এই ভোগবাদিতার যুগে এ কাজটি আরো আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এরা প্রথমে অত্যন্ত চতুরতার সাথে এই বলে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে; যৌন আকর্ষণ এমন একটা শক্তি যার মাধ্যমে তারা লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করতে পারে। তাদের সৌন্দর্যের গুণগান করে, তাদের আধুনিক নারীর খেতাব দিয়ে এবং এ ধরনের নানা প্রকার ছলনার জাল বুনে তাদের রাজপথে, ক্লাবে, ডান্স বারে এবং ছোট বড় পর্দায় উলঙ্গ ও অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যত বেশি দুঃসাহস পাওয়া গেছে, ততটা সাফল্য লাভ করার মঞ্জিল অতিক্রম করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। এভাবে পুরুষ তাদের চোখে ঠুলি বেঁধে নিজেদের তানপুরার সুরে তাদের নাচিয়ে চলেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য তাকে প্রতারিত করে পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী উভয় শ্রেণীর লোক শোষন করে চলেছে।

আজকের মানুষের প্রয়োজন এত বিস্তৃত হয়ে গেছে যে, বলা হচ্ছে যতক্ষণ না পুরুষের সঙ্গে নারীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অর্থনৈতিক দৌড়ঝাঁপে শামিল হবে ততক্ষণ তা পরিপূর্ণ করার কোন উপায় বের হতে পারে না। আর একমাত্র সমাধান নারীদের চাকরিতে অংশগ্রহণ করা। আসলে পশ্চিমারাই এই প্রবণতার বিস্তার ঘটিয়েছে। আর এখন তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশে নারীর চাকরির সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষ দ্রুত এই দৌড়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং নারীরা দলে দলে চাকরিতে এসে পুরুষদের সঙ্গ দিচ্ছে। তবে এর সাথে সাথে এই তিক্ত সত্য ও এখন অনাবৃত হয়ে সামনে এসেছে, মানুষের প্রয়োজনের তালিকা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ মৌলিকভাবে মানুষের মধ্যে আরো বেশি পাওয়ার প্রেরণা একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ক্রমবর্ধমান। তার লালসার ক্ষুধা কি কখনো নিবৃত্ত হয়? বস্তুবাদিতার বাড়বাড়ন্তের এই যুগে মানুষ যত বেশি অর্জন করে ততই সে লোভী হতে থাকে। প্রকৃতিগতভাবে লক্ষ্য করলে মানুষ তখনই প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে, যখন আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য মধ্যপন্থায় থিতু হয়। কোন নারী সংসার চালানোয় দক্ষ বা সতর্ক হলে অল্প আয় করেও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারে এবং পরিবারকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে পারে। অপরপক্ষে পুরুষ এবং নারী উভয়েই যখন অর্থোপার্জনের

প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কে অবশিষ্ট থাকবে? ফলে এমতাবস্থায় উপার্জন অবশ্যই দ্বিগুণ হয় তবে তার সাথে সাথে সে মতো অপচয় ও অনাবশ্যক খরচের বহরও বাড়ে। এই ধরণের মানুষরা মাসের শেষে গিয়ে কাঙ্গাল ও ঋণগ্রস্ত হয়েও পড়ে।

ইসলাম অর্থনীতির গুরুত্বকে মেনে নেওয়ার সাথে সাথে সে ব্যাপারে অত্যন্ত মধ্যপন্থি ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব থেকে এজন্যেই মুক্তি দিয়েছে, যাতে সে একাগ্রচিত্তে ঘর সংসারের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হতে পারে। নারী যখন একাগ্রচিত্তে পরিবার সামলায় তখন বাড়িতে সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষিত হতে থাকে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব মুক্ত নারী তার স্বামীর সম্পদের মালিক। সে সম্পদ ব্যয় করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং সে তার ইচ্ছামত তা থেকে খরচ করতে পারে। আর সে নিজেও সম্পদশালীনী হলেও তার ভরণপোষণের দায়িত্ব কিন্তু পুরুষের। এভাবে ইসলামী পরিবারের ব্যবস্থাপনায় নারীকে জোর করে চাকরি কিংবা অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য করা যায় না। এটা তার মর্জি ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা তার রয়েছে।

নারী চাকরি করবে কি করবে না? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্ব দুশ্চিন্তার শিকার। একদিকে তার পূর্ণ স্বাধীনতার জিগির তোলা হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে তার ভিত্তি বলা হচ্ছে। একথাও বলা হচ্ছে যে নারী আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়েই সঠিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। তবে অন্যদিকে তার কাছ থেকে সেজন্য বড় বড় কুরবানি দেয়ার দাবি করা হচ্ছে। তার সামনে বিভিন্ন ক্যারিয়ারের অবকাশ রেখে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, সে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নিজের পারিবারিক জীবন কিংবা নিজের দাম্পত্য বন্ধন কে মুলতুবি করে দিক বা বিদায় দিক। আশ্চর্যের কথা হল এখন দাম্পত্য বন্ধনকে একটা অকারণ বন্ধন রূপে পেশ করা হচ্ছে, যাতে নারীর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এর বিকল্প হিসেবে তাকে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম পন্থা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে সে তার যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার সরঞ্জাম গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, এখন তো তাকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে সে স্থায়ী বিবাহ বন্ধনের পরিবর্তে সাময়িক

স্বামী নির্বাচন করে নিক। বিবাহ বহির্ভূত মা হয়ে একক অভিভাবকের স্বাদ গ্রহণ করুক। একটা স্বামীর দাসত্ব থেকে এভাবে সে মুক্তি পেতে পারে, যেহেতু সে নিজের ভরণপোষণ নিজেই করতে সক্ষম। সাময়িক স্বামীর মাধ্যমে তার সন্তান হলে সে নিজের ইচ্ছার স্বাধীন মালিক হয়ে তাকেও লালন পালন করতে পারে। সুতরাং বিয়ে-শাদির অস্বস্তিকর ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে সে নিজের জীবন নিজেই অতিবাহিত করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে এবং হয়েও চলেছে। নারীকে এই বলে মানসিকভাবে উৎসাহিত করা হয় যে স্বামী-সন্তান এসব তো অনভিপ্রেত বিষয়, এতে তার স্বাধীন জীবনাচরণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সেজন্য সে বিয়ে করলেও পরিবারকে নিজের হিসেব মতো পরিকল্পনা করুক। আর বিয়ে না করলেও এমন অনেক পন্থা আছে যা অবলম্বন করে সে কারো সঙ্গে 'নিরাপদ যৌন সম্পর্ক' রক্ষা করতে পারে। বাজারে নিত্যনতুন গর্ভনিরোধক দ্রব্য তার কাছে সহজলভ্য; সাধারণতঃ উঠতি বয়সের তরুণী নারীরা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ হতে নিরাপদ থাকার জন্য সেগুলো ব্যবহার করে থাকে। এতে যে কেবল তরুণ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা নয় বরং বিভিন্ন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতেও তারা সংক্রমিত হচ্ছে। জনসংখ্যার অনুপাত কমে যাচ্ছে এবং দুনিয়া এই সঙ্গীন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার অনুপাত একটা তীব্র সংকটের পূর্ব লক্ষণ। বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানীরা এই সংকট সম্পর্কে অবশ্যই কিছুটা উপলব্ধি করছেন বটে, তবে তার কোন সঙ্গত ও গ্রাহ্য সমাধান পেশ করতে অক্ষম।

মূলতঃ নারীর চাকরি করার যুগেই এই প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং বহুমুখী আমদানির মাধ্যম থেকে জীবনে অপ্রয়োজনীয়' বিলাসিতাও বৃদ্ধি পেলেও তার সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন জটিলতায় জড়িয়ে পড়ছে। যেখানে নারী বিবাহিতা, তদুপরি সে চাকরি করার জন্য গোঁ ধরে বসে আছে সেখানে এ প্রশ্নও ওঠে যে পুরুষ এখন ঘরদোর ও সন্তান সামলাবে, রান্নাঘরের কাজে সে অংশগ্রহণ করবে, শিশুদের পরিধেয় কাপড়চোপড় সেই পাল্টাবে ও পরিস্কার করবে, দুধের বোতল সেই প্রস্তুত করবে, কারণ চাকুরিজীবী স্ত্রীর তো একটু আরাম ও স্বস্তির প্রয়োজন আছে! পুরুষরা কদাচিৎ এগুলো মানতে পারে। কারণ এখানে পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর সংসারে খুঁটিনাটি বিষয়ে কলহ, মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটির

সীমা অতিক্রম করে পারিবারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করে এবং কথায় কথায় তালাক, বিচ্ছেদ ও কোর্ট কাছারি পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ির পরিস্থিতি তৈরি হয় ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যায়। বর্তমান যুগের মানুষ অর্থ তৈরীর মেশিনে পর্যবসিত হয়েছে। আবেগ ও প্রেরণার কোন মূল্য অবশিষ্ট নেই, আত্মীয়তার সম্পর্কও এখন অর্থের ভিত্তিতে সুদৃঢ় হয়। সারকথা প্রত্যেক মানুষ এখন স্ব স্ব স্থানে স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।

নারীর বাধ্যতামূলক চাকরির প্রেক্ষিতে এইসব প্রশ্ন একটি মাত্র চীনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে, আর সেটা হল সমাজের ধ্বংস ও সর্বনাশ। সবক্ষেত্রে একটিমাত্র পক্ষ, যেখানে নারী এবং পুরুষ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একটি স্থায়ী সংঘর্ষ চলমান। নারী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক কারবারে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব আজও অবশিষ্ট রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে পুরুষের হাতে রয়েছে এর কলকাঠি এবং এজন্য এই প্রতিযোগিতায় বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নারী অগ্রসর হতে পারছে না। পরিণতি? সংসারের শান্তি খতম হচ্ছে। সন্তান বিগড়ে যাচ্ছে, নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক দিক দিয়ে সে উদাসীন হয়ে পড়ছে। পাশ্চাত্য দেশে এবং দুনিয়ার পাশ্চাত্য প্রেমী অন্যান্য প্রান্তে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে। অচিরেই এই পরিস্থিতি সর্বত্র উদ্ভাসিত হবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাপকতাকে সামনে রেখে এসবের পর্যবেক্ষণ করলেই একথা সহজে বুঝে আসে যে, ক্বুরআন নারীদের অর্থ উপার্জন করার দায়-দায়িত্ব থেকে পৃথক রেখে কেবলমাত্র তার প্রতি পরম উপকার সাধন করেছে এই নয় বরং গোটা সমাজকে প্রশিক্ষণহীনতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। আর যেখানে প্রয়োজনের তাগিদে নারী অর্থ উপার্জনে নামতে বাধ্য হয়, সেখানে তার জন্য কিছু সীমারেখা ও শর্ত স্থির করে দিয়েছে। যাতে সমাজ ভারসাম্যহীনতার শিকার না হতে পারে। এই সীমারেখা গুলো রক্ষা করা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক বা ফর্য। যেমন সে মূলতঃ বাড়ির পরিচালিকা, স্বামীর সম্পদ রক্ষক এবং নিজ সন্তানের তত্ত্বাবধায়িকা। তাই তার জন্য এমন কোন কাজ ও পেশা অবলম্বন করা ঠিক হবে না, যে জন্য তার মৌলিক দায়-দায়িত্ব প্রভাবিত হয়।

পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় নারীকে স্বামীর অনুগত সৈনিক করে দেওয়া

হয়েছে। তার মানে এই নয় যে সে স্বামীর থেকে নিম্নমানের। এটা এজন্য করা হয়েছে যাতে পারিবারিক শৃঙ্খলা সুসংহত থাকে তাতে কোনো রকমের ফাটল না ধরে। আবার এজন্য ও যে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করার আদেশ করা হয়েছে। আল-কোরআনে স্বামী এবং স্ত্রীকে যেখানে সম পর্যায়ের বলা হয়েছে সেখানেই তাদের সম্পর্কের উদ্যেশ্য লক্ষ্য ও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"। (-আর্ রূ-ম: ২১)

স্বামীকে বাড়ির পর্যবেক্ষক করা হয়েছে যাতে পরিবারে একজন নেতার বর্তমানে তার ব্যবস্থাপনা সুশৃংখলভাবে কায়েম থাকে:

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

"পুরুষ নারীর কর্তা। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে"। (-আন্ নিসা :৩৪)

তবে এতদসত্ত্বেও উভয়ের অর্জিত সম্পদকে স্বতন্ত্র মালিকানার অধিকার দিয়ে বলা হয়েছে:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"যা কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী।

আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী"। (-আন্ নিসা: ৩২)

ইসলামী ব্যবস্থাপনার মানসিকতা হল, তা অনিষ্ট ও দূষণ বিস্তার করার পূর্বে তা সৃষ্টি হওয়ার যাবতীয় উৎসকে তালাবদ্ধ করে দেয়। নারী যেহেতু পুরুষের অনুগত, সেজন্য সে তার স্বামীর অনুমতিক্রমেই অর্থ উপার্জনের জন্য কোন কাজ করতে পারে। পরিবারকে স্থিতিশীল করার জন্য এটার প্রয়োজন রয়েছে। সাথে সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা হল সে এমন কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে না যেখানে নারী ও পুরুষের মিশ্রণ এবং অবাধ মেলামেশা এতটাই যে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন হিজাব অবশিষ্ট থাকবে না। এই সীমারেখা মেনে মুসলমান নারী সমস্ত উপাদেয় ও বৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তার এসব উপার্জন সম্পূর্ণ তারই হবে।

এমন নয় যে এইসব সীমারেখা মেনে চলা সম্ভব নয়, কিংবা এত কঠিন যে তা বাস্তবায়ন করা জটিল ও দুরুহ। মুসলিম মহিলারা এই সীমারেখার মর্যাদা রক্ষা করেন এবং আজও করে চলেছেন। প্রিয় নাবী ﷺ এঁর যুগে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে মহিলারা নিজেদের দায় দায়িত্ব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পালন করে ভিন্ন দাসিত্ব পালন করতে কোন ত্রুটি করেননি। সাথে সাথে প্রয়োজন পড়লে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী কোন পেশা অবলম্বন করেছেন কিংবা ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছেন এবং নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করেছেন কিংবা কোন লক্ষ্যে (যেমন স্বামীর দ্বীনি দায়িত্ব পালন ও দ্বীন প্রচার প্রসারে ব্যস্ত থাকা) পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

নাবীজী ﷺ -এঁর যুগে এমন বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; যেখানে নারীরা কৃষি ক্ষেত্র কিংবা বাগান বাগিচায় কাজ করা দূষণীয় মনে করতেন না। তাঁরা মাথায় ফসলের বোঝা তুলে নিয়ে বাজারে গিয়ে নিজেদের মালপত্র বিক্রি করতেন। এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালে রণাঙ্গনে আহত মুজাহিদদের পানি পান করাতে, তাঁদের পরিচর্যা করতে এবং তাঁদের ক্ষতস্থানে চিকিৎসা করতে দেখা গেছে। প্রয়োজনে নারীরা অস্ত্রহাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করেছেন। সে সময় নারীরা স্বাধীন বা যৌথ ব্যবসাও করেছেন কেউ তাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। তাঁরা শিক্ষা, সাহিত্য ও পঠন

পাঠনের দায়িত্বও পালন করতেন এবং নিজেদের সহায়-সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণ করাও জানতেন। এসব কাজে তাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কল্যাণমূলক কাজের জন্য অনায়াসেই নারীরা বাড়ির বাইরে দৌড়ঝাঁপ করতেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রা-এর মাসিমা যখন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে নিজের ইদ্দত কালীন সময়ে তাঁর খেজুর গাছ কাটা ও বিক্রি করার ইচ্ছা করলে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে কঠোরভাবে একাজ করতে নিষেধ করলে তিনি এই প্রশ্ন নিয়ে প্রিয় নাবী ﷺ-এর কাছে সমাধানের জন্য গেলে, তিনি উত্তরে বলেন:

তুমি বাগানে যাও খেজুর গাছ কাটো (এবং বিক্রি করো) খুব সম্ভব সেই টাকায় তুমি দান-খয়রাত কিংবা অন্য কোনো ভালো কাজ করতে পারবে (এভাবে এই কাজ তোমার জন্য পরকালে পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ হবে)" (-আবূ দাউদ; তালাক অধ্যায়)

অনুরূপ একটি ঘটনা বুখারী শরীফের বিবাহ অধ্যায়ে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে:

হযরত আবু বাকর রা-এর কন্যা হযরত আসমা রা বলেন:

"হযরত যুবাইর রা-এর সঙ্গে তার বিয়ের পর তিনি তাঁর যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করতেন, সাথে সাথে বাড়ির কাজকর্মও দেখাশোনা করতেন। যেহেতু যুবাইর রা-এর কাছে কোন খাদেম বা সেবক ছিলনা, আর না ছিল কোন উট। এজন্য হযরত আসমা স্বয়ং তাঁর ঘোড়ার ঘাস ও পানি খেতে দিতেন, বালতিতে পানি ভরতেন এবং তাঁর কৃষি জমিতে খেজুরের আঁটি বীজ বয়ে নিয়ে আসতেন"

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নাবী-যুগে মহিলারা বেশ এগিয়ে ছিলেন। ছোট-বড় উভয় প্রকার ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণ করা ছিল জল ভাত। হযরত খাদীজা রা একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর ব্যবসার যাবতীয় বিষয় নিজেই তদারকি করতেন। ব্যবসার জন্য সব ব্যবস্থাও তিনি সামলাতেন। হযরত সাওদা ছিলেন একজন দক্ষ হস্তশিল্পী। চামড়া শুকিয়ে পরিশুদ্ধ করার কাজ করতেন। যা আজকের আমাদের ভাষায় লেদার টেকনোলজি (চর্ম প্রযুক্তি) নামে পরিচিত। হযরত 'আ-য়িশা সিদ্দিক্বা রা

যুগপৎ একজন বাগ্মী ও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শীনী ছিলেন; এবং ইতিহাস, কবিতা ও সাহিত্য এবং পঠন-পাঠনের কাজ সম্পাদন করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ রা-এর স্ত্রী কারুকার্য ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে তাঁর নিজের এবং নিজের স্বামী ও সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতেন।

একদিন তিনি প্রিয় নাবী ﷺ সকাশে এসে এভাবে বললেন:

আমি একজন হস্তশিল্প মহিলা জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করি, (এভাবে আমি তো উপার্জন করতে পারি কিন্তু) আমার স্বামী ও সন্তানদের উপার্জনের কোন মাধ্যম না থাকায় তারা) কপর্দকশূন্য"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

"তিনি কি তাদের জন্য খরচ করতে পারেন?"

প্রিয় নাবী ﷺ উত্তরে বললেন:

হ্যাঁ! তুমি তার জন্য পুরস্কার পাবে"। (-ত্বাবাক্ব-তু ইবনু সা'দ)

নবী-যুগে যেভাবে ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তাতে নারীদের উপর কোন ধরনের অস্বাভাবিক চাপ কিংবা প্রতিবন্ধকতা খুঁজে পাওয়া যায় নি, আর না কোনো অনর্থক বাধাবিঘ্ন তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে। সে সময় যদি কোথাও কোন নারীর উপর অত্যাচার করা হতো কিংবা তাঁদের অধিকার খর্ব করা হতো, আর কেউ তা দেখে ফেললে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে সে দিকে মনযোগ দিতেন এবং তা নির্ভরযোগ্য হলে তাঁরা প্রিয় নাবী ﷺ-এর কাছে তা পেশ করে করে তার উত্তর সংগ্রহ করতেন।

ভাববার বিষয় হলো বর্তমান যুগ এবং নাবী ﷺ-এর যুগের মধ্যে কত শত বছরের দূরত্ব, তথাপিও সে যুগে নারীরা যে উন্নতি ও প্রগতি অর্জন করেছিলেন তা আজ কোথায়? মুসলিম সমাজ হোক অথবা অমুসলিম সমাজ, উভয় ক্ষেত্রেই নারীর পক্ষে সহজে নিজের অবস্থান রচনা করা নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও মানসম্মান রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার অবকাশ কোথায়? কথা কেবল এতোটুকু নয় যে আজকের সমাজের লাগাম পুরুষদের হাতে এবং পুরুষরা না নিজেদের আমিত্বকে ছাড়তে পারছে আর না পারছে নিজেদের

স্বার্থ ত্যাগ করতে।

আজ নারীরা যেখানে চাকরি করে সেখানে লিঙ্গ বৈষম্যের সম্মুখীন হয়, যেখানে লেখাপড়া করে সেখানেও এবং যেখানে ব্যবসা করে সেখানেও তাকে নানান জটিলতার মোকাবিলা করতে হয়।

তাদের প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে হয়রানির সঙ্গে আপস করতে হয়, নানান বিদ্রূপ ও বাক্যবাণ সহ্য করতে হয় । সব রকমের জটিলতা সত্ত্বেও সে সব হাসিমুখে বরণ করতে হয়। সব রকমের বাধা সত্ত্বেও হাসতে হয়। এতকিছু করেও তাকে পুরুষদের মত উন্নতি জোটে না। তারমধ্যে একা নিজের কাজ করার সাহস ও অকুতোভয়তা সৃষ্টি হয়েছে। তবে পুরুষদের জগতে তারা আজো তাদের সাথে মুকাবিলা করতে পারে না। নিজেদের লজ্জা শরমকে তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে। তবুও সে নিজেকে পুরুষের লালসার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আজকের নারীরা অবশ্যই পুরুষ সেজে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, তবে আখেরে তার ভাগ্যে জুটছে মানসিক ও দৈহিক কষ্ট, এবং উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ। নিজেদের নারীত্বকে বিসর্জন দিয়েও তারা কিছু পায়নি। সব ক্ষেত্রে তাদের হয়রানির আশঙ্কা লেগেই আছে। এই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য তারা পুরুষদের পোশাক গ্রহণ করতে শুরু করেছে, নিজেদের সুরক্ষার কৌশল শিখেছে তবুও তারা শতভাগ সফল হয়নি।

বর্তমান যুগের মহিলারা চাকরি করাকে নিজেদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র মনে করে। মধ্যশ্রেণীর মহিলারা চাকরির মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে একটু আকর্ষণীয় করে নেয়, তারপর এই চাকরি তাদের বাড়ি থেকে বাইরে বের হওয়ার একটা অজুহাত হিসেবে পেশ করে। তার মাধ্যমে নিজের বিনোদনের সামগ্রীও সঞ্চয় করে এবং সেজন্য তার দিকে সাগ্রহে ধাবিত হয়। অথচ এটাই হয় তার জন্য একটা মারাত্মক পরীক্ষার উপাদান। এইসব কর্মী মহিলারা কেবল নিজেদের দায়িত্ব পালন করে তাই নয় বরং তাকে তার বসকে খুশি করার জন্য অনেক সময় তার কুপ্রবৃত্তিকে শান্ত করার সামগ্রী হতে হয়। তবুও কথায় কথায় তাকে সংকুচিত করা এবং চাকরি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া কিংবা মাইনে কেটে নেওয়া তাদের বসের চরিত্র। সামান্য বাহ্যিক উপকারের জন্য এত বড় ক্ষতি কিনে নেওয়া কি ধরনের বিবেচনা?

আজকের আধুনিক সমাজ নিজেকে যত উন্নত চিন্তাশীল মনে করুক, এটা একটা তিক্ত বাস্তব যে নারীর ব্যক্তিগত উপার্জনের উপর আদৌ তার কোনো অধিকার থাকে না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক তার উপার্জন মূলত তার স্বামীর উপার্জন। তার উপার্জন কিংবা মাইনে অবশ্যই তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও মালিকানা হয়ে যায়। ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোনও সমাজ হোক, তার আমদানি কিংবা মাইনের উপর তার পূর্ণ মালিকানা স্বীকার করে না। কেবলমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এর অবকাশ রয়েছে যে নারী তার উপার্জনের শতভাগ মালিকানার অধিকারী। তা থেকে খরচ করার অধিকার তার স্বামীর পর্যন্ত নেই, অথচ স্বামীর উপার্জন কিংবা মাইনের উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহনের থেকে উত্তম কোন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? ইসলাম নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছে এবং সাথে সাথে তাকে মালিকানার অধিকার দিয়ে তাকে অধিক স্থিতিশীলতাও দান করেছে। যতদূর মুসলমান সমাজের ব্যাপার, তো সেখানে যদি প্রকাশ্যে অন্যান্য বিধি-বিধানের মত এই কানুনকে ভঙ্গ করা হয় তাহলে তাতে ইসলামের অপরাধ কোথায়? আর তা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে ইসলাম অর্থনীতির দিক দিয়ে নারীদের পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে, কতদূর সঠিক?

নারীরা আজ অতিমাত্রায় অর্থনৈতিক দৌড়ঝাঁপে অংশগ্রহণ করছে। তা সেই মুসলমান হোক, অন্য মুসলমান হোক। তবে মুসলমান মহিলাদের কি হলো যে তাদের অধিকাংশই একটুআধটু শিক্ষিতারা ইসলাম এবং ইসলামী নিয়মনীতি সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। আর তা এজন্য হয়, যে এ ধরনের মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না অথবা এদিক ওদিক থেকে শোনা কথাকে ইসলামের সঙ্গে জুড়ে দেয়। এজন্য এই ধরনের মহিলারা যেখানেই মুসলমান নারী হিসাবে সামনে আসে, তারা ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করে। তারা দুঃখ প্রকাশ করার ভঙ্গিতে বলে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করায় নি। ইসলামী আইন-কানুন এত কঠোর যে তানিয়ে আধুনিক দুনিয়ার সাথে চলা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে বিকল্প এমন কোন আদর্শ যা মুসলিম সমাজের দৃষ্টান্তে মেলা ভার, যেখানে পূর্ণ মধ্যম পন্থা এবং সুরক্ষাসহ ইসলামী প্রতীককে অক্ষুন্ন রেখে নারীরা চাকরি করতে পারে অথবা নিজের কোন স্বাধীন পেশা অবলম্বন করতে পারে কিংবা কোন ব্যবসা করতে পারে।

সর্বত্র নারী-পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশার দরুণ অদ্ভুত জটিলতা, নোংরামি ও নৈতিক পতন বিরাজ করছে। এহেন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমান নারীর পক্ষে ইসলামী পোশাক পরে পুরুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে মেলামেশা বিহীন কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এভাবে তারা এই চিন্তা করে যে ইসলামকে পিছনে ফেলে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটাই সহজ। পরিণামে সে দ্বীন থেকে তো কেটেই পড়ে; আর সে কতটা দুনিয়া অর্জন করতে পারে তা আমরা দেখে নিয়েছি। যাহোক এখন মুসলমান নারীদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে তারা অর্থ উপার্জনের জন্য এমন কি শাসন পদ্ধতি মেনে চলবে যা তার পরিচয়কে আহত করবে না অথচ সে কোন কাজ কিংবা উপার্জনের সুযোগ ও লাভ করবে!

আজকের শিক্ষিকা কিংবা পাঠরতা মুসলিম নারীর সামনে এই যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তারা দ্বীনের দাবী তার সীমারেখা মূলনীতিকে জীবিত রেখে কোন কাজ করুক এবং আমরণ সেগুলো নিরাপদ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক, তা একাজে তার যতই ক্ষতির আশঙ্কা থাকুক না কেন।

তাদের সর্বপ্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করতে হবে সেটা হল; তারা ইসলামের মেযাজকে বুঝে ইসলামের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনের সত্যতা মানসপটে এঁকে দেখুক যে এইসব সীমারেখা ও মূলনীতিমালার মধ্যে তার জন্য কি কি উপকারিতা লুকিয়ে আছে। উদার মনে যদি সে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করে তাহলে কার সামনে ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। এজন্য সরাসরি কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করতেই হবে। তৎসহ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিদগ্ধ লেখকদের রচনাবলীও পড়া আবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব ক্ষেত্রে নারীরা কি কি জটিলতা ও সমস্যায় আক্রান্ত। এ বিষয়ে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্র সাময়িকীতে বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়। অনায়াসে তুলনামূলক পর্যালোচনা করার জন্য এসব জানা একান্ত জরুরি। মুসলমান নারীর জন্য হালাল ও হারামের পার্থক্য এবং এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে ওয়াক্বিফহাল হওয়া উচিত। ইসলাম মহিলাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিভাবে অক্ষুন্ন রেখেছে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। তাহলে আত্মসম্মান ও মর্যাদা কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার চেতনা

নিজের মধ্যে সৃষ্টি হবে।

নারীরা যেখানেই সচেতনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় প্রভাবিত হয়েই করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ইউরোপ, আমেরিকার মতো দেশে-যেখানে সব থেকে বেশি নির্লজ্জতা বিরাজ করছে- মহিলারা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চোখে পড়ছে। তাদের জীবনের ঘটনাবলী, ইসলাম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পর্দা এবং মহিলাদের অধিকারের প্রতি তাদের মতামত জানার চেষ্টা থাকা উচিত। জীবনের জন্য সম্পদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সম্পদের থেকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই সব চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিকোণ যা গ্রহণ করে একজন নারী সম্মানজনক জীবন-যাপন করতে পারেন। মুসলমান মহিলারা যদি এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারে, তাহলে তারা নিজেদের জীবনের জন্য একটা মূলনীতি রচনা করতে পারে।

মুসলমান মহিলারা ইসলামী মূল্যবোধকে টিকিয়ে রেখে আল্লাহর শেখানো সীমারেখা রক্ষা করে চাকরি করতে পারে না, এমন মনে করা নিতান্তই ভুল। আধুনিক যুগে এমন শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে যেখানে মুসলমান মহিলারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আত্মবিশ্বাস সহকারে অগ্রসর হচ্ছেন। এবং তারা প্রমাণ করছেন এই মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রেখে কোন নারী সবচেয়ে সেরা কাজটি করতে পারেন। পরিপক্ক ঈমান এবং বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মহিলারা এ পরিস্থিতিতেও আসন্ন এসব বাধাকে শক্তভাবে মুকাবিলা করেছেন।

প্রয়োজনের জন্যই হোক অথবা নিজের যোগ্যতাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য হোক, মুসলমান নারীদের কর্তব্য হলো তারা যে কোন পেশা অবলম্বন করুক তা যেন কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত হালাল পন্থায় হয়। মুসলমানদের হালাল রুজি অন্বেষণ করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং হালাল উপার্জন অল্প হলেও তা যথেষ্ট মনে করা মুসলমানদের চিরাচরিত মানসিকতা। মুসলমান মহিলাদের সর্বাবস্থায় এমন চাকরি করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা ইসলামের বিধি নিষেধকে অক্ষুন্ন রেখে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এখন তো চাকরির ক্ষেত্রেও বহু বিকল্প রয়েছে, যার মাধ্যমে নারীরা সহজেই নিজের পারিবারিক দায়িত্বকে প্রভাবিত না করেও তা গ্রহণ করতে পারে। এমনও বহু কাজ আছে, অফিসে না গিয়েও বাড়িতে বসে অর্থোপার্জন করে আত্মনির্ভর হওয়া যায়। লেখালিখি এবং পুস্তক রচনা ক্ষেত্রে ও সুস্থ সাহিত্য রাজি রচনা করায় মুসলমান মহিলারাও নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ময়দানেও এমন কাজ হতে পারে যাতে মহিলারা পর্দায় থেকেও সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে। বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও হাসপাতালে মহিলাদের জন্য কর্মের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে মহিলাদেরই প্রয়োজন পড়ে। মহিলাদের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বহু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্র পরিসরে বা বৃহৎ পরিসরে তা করতে পারেন।

বর্তমানের মুসলমান মহিলাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, পাশ্চাত্যের অবাধ স্বাধীনতা তার জন্য কোন দিক থেকে উপকারী নয় পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার ধারণাও কেবল একটা অন্তঃসারশূন্য দাবি। তা নারীদের ভুল পথে পরিচালিত করে। তার মূল ক্ষমতা শক্তি অর্থাৎ নারীত্বকে ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু দেয়না। আর নারী থেকে নারীত্ব হরণ করা হলে অতঃপর তাঁর কাছে আর কিইবা অবশিষ্ট থাকতে পারে?

আজকের মুসলমান নারীকে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক অনুশীলনও করতে হবে যাতে তারা নিজের বন্ধু ও শত্রুকে চিনতে পারে। কারোর প্রতারণার ফাঁদে জড়িয়ে না পড়ে যেখানে যৌন কিংবা মানসিক শোষণের আশঙ্কা থাকবে। কখনো কখনো মুসলমান মহিলারা কোন কঠিন অসহায়ত্ব বা ভীতি প্রদর্শনের চাপে পড়ে এমন পেশা অবলম্বন করে যেখানে পড়ে তাকে বহু কাঠিন্যের সম্মুখীন হতে হয়। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, সে এই দুনিয়ার কয়েক দিনের স্বার্থ কামনা করে কিংবা দ্বীন ও ঈমানের সাফল্য? যখন এটা সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন তাকে কোন ধরনের উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হতে হয় না। শরীয়তের বিধি-বিধানে যেসব সীমারেখা তার জন্য নির্ধারিত করা আছে, কোন অবস্থাতেই সে তা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাকে আল্লাহর সামনে তার প্রতিটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে।

একথা যথাস্থানে সর্বজনবিদিত যে, জীবিকার মালিক বিশ্ব জাহানের নিয়ন্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্। তিনি যাকে ইচ্ছা যত খুশি দান করেন এবং যার কাছ থেকে খুশি তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শরী'য়াতী বিধি-বিধানের সাথে হালাল ও হারামের পার্থক্য ও শিখিয়েছেন। হালাল রুজি অর্জনের দোয়া আমাদের সামনে খোলা আছে। এখন প্রয়োজন, আমাদের সেই সব দরজা পর্যন্ত পৌঁছানোর সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং আমাদের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা খুঁজে নেওয়ার সাধনা করা এবং ভুল পথের উপর সঠিক পথের অগ্রাধিকার দেয়া। তবেই মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং জীবন ও আমাদের জন্য হবে শান্তিপূর্ণ, ইনশা-আল্লাহ্।

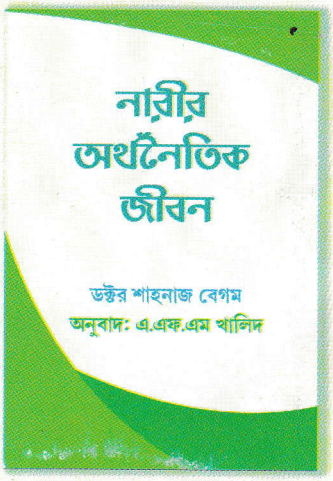

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩